

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস আছে ১৯৪৭ এর ভারতপাকিস্তান - বিভক্তির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এই সংক্ষুব্ধ হওয়ার পর্যায়টি ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রথম রূপ লাভ করে। কারণ উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্তকে এদেশের মানুষ মেনে নেয়নি। ফলে শুরু হয় বিক্ষোভ আন্দোলন। অবশেষে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সৃষ্টি হয় রক্তক্ষয়ী ইতিহাস। রংপুরের জনগণও এই ভাষা আন্দোলনে মিছিল শোভাযাত্রায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতেকালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ বৈষম্য এসব কিছু বিবুদ্ধে সারাদেশে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এক্ষেত্রে রংপুর পিছিয়ে থাকেনি। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের পর পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি ফলে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। এরপর ২৫ মার্চ এর ভয়াল কাল রাত্রির পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ রংপুরও এই মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠে।

স্বাধীনতাকামী রংপুরের মানুষ ৩ মার্চ প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ রংপুরের শংকু সমজদার। ৩ মার্চে রংপুরে ৩ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং এদের প্রাণদানের মাধ্যমে শুরু হয় রংপুরের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে রংপুরের সকল শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ৩ মার্চ থেকেই ২৪ মার্চ রংপুরে কারফিউ চলে। এ অঞ্চলের মানুষ সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ করে ২৪ মার্চ। ২৮ মার্চ রোববার রংপুরের মানুষ জেগে উঠেছিল এক নবচেতনায়। স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে লাঠিসোটা, তীর ধনুক, বল্লম ইত্যাদি সহযোগে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে বেলা ৩টার দিকে ০০। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ রংপুরের মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল হতে লাঠিশোটা, তীর ধনুক, বল্লম,দা,কুড়াল ইত্যাদি সহযোগে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে বেলা ৩০০। ঘটিকার দিকে। এতে ক্যান্টনমেন্টের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈন্যরা এ সমস্ত বিক্ষুব্ধ জনতার উপর ঝাপিয়ে পরে এবং অসংখ্য মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। রংপুরের অগণিত মানুষ প্রাণ দিয়ে সৃষ্টি করে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ৩ এপ্রিল মধ্যরাতে রংপুরের প্রথম গণহত্যা ঘটে দখিগঞ্জ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। এরপর ক্রমান্বয়ে বলারখাইল গণহত্যা, ঝাড়ুদার বিল ও পদ্মপুকুরের গণহত্যা, জয়রাম আনোয়ার মৌজার গণহত্যা, সাহেবগঞ্জের গণহত্যা, লাহিড়ীরহাটের গণহত্যা, ঘাঘটপাড়ের গণহত্যা, নিসবেতগঞ্জ গণহত্যা, দমদমা ব্রীজ গণহত্যা, জাফরগঞ্জ গণহত্যা প্রভৃতি নৃশংস হত্যাকাণ্ডে রংপুরবাসী তাদের প্রিয়জনকে হারায়। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলকসা অনুযায়ী ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ রংপুর কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থারত অধ্যাপক) চিত্ত রঞ্জন, অধ্যাপক রাম কৃষ্ণ অধিকারী ও অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তী(অধ্যাপকগণকে রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে হত্যাকরে দমদমা ব্রিজের পাশে এক বাঁশঝাড় গণ কবর দেয়। এছাড়াও অধ্যাপক কালাচাঁদ রায় ও তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয় এবং এই ধারাবাহিকতায় হত্যা করা হয় অধ্যাপক আব্দুর রহমান ও অধ্যাপক সোলায়মানকে। এ সময় হানাদার বাহিনীর নির্ধাতনের কেন্দ্রস্থল ছিল রংপুর টাউন হল

সময়ের সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রংপুরে। ১২ ডিসেম্বর রংপুর সেনানিবাস ছাড়া সমগ্র রংপুর মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৩ ডিসেম্বর গংগাচড়া থানায় সর্ব প্রথম ২১২ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করে ১৫ ডিসেম্বর তিস্তা ব্রীজে হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। ১৬ ডিসেম্বরও রংপুর শহর ও শহরতলীতে লড়াই চলতে থাকে। ১৭ ডিসেম্বর

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয়বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল। নয়মাস অবরুদ্ধ মানুষ খুঁজে পায় মুক্তির আশ্বাদন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় দেশপ্রেম আর অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে রংপুরে উদ্ভিত হয় স্বাধীনতার রক্তিম লাল সূর্য।

ঐতিহাসিক রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও

শেখ আমজাদ হোসেন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বাঁশের লাঠি আর তীর-ধনুক নিয়ে পাকিস্তানি হায়েনাদের আবাসস্থল ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের ঘটনা বোধকরি পৃথিবীর ইতিহাসে অবাক করে দেওয়ার মতোই একটি ঘটনা। আর এমনি এক ঘটনাই সেদিন ঘটিয়েছিলেন রংপুরের বীর জনতা। একান্তরের ২৮ মার্চ রংপুরের বীর জনতারপূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সেদিনের সেই ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ অভিযান যদি সফল হতো, তা হলে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হতো। মুক্তিযুদ্ধে রংপুরের মানুষের সেই বীরত্বগাথা কাহিনী দেশ ছেড়ে বহির্বিশ্বের মানুষেরওরোম শিউরে ওঠার মতো বিষয়।

মূলত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল ৩ মার্চ ঢাকা সিলেট ও রংপুর থেকেই। ইয়াহিয়া খানের কূটকৌশলের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল ডাকেন। হরতাল সফল করতে আগের দিন ২ মার্চ রাতেছাত্রলীগ রংপুর জেলার তৎকালীন সভাপতি রফিকুল ইসলাম গোলাপ সেন্ট্রাল রোডের পাঞ্জা হাউসের (বর্তমান গ্রামীণ টাওয়ার) ছাদে এক সভা ডাকেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরের দিন সকালে দলমত নির্বিশেষে সবাই শহরের জিরো পয়েন্ট কাছারি বাজারে জমায়েত হন। তখনো অল্পসংখ্যক মানুষ; কিন্তু মিছিলটি বের হওয়ার পরই আস্তে আস্তে তা রূপ নেয় বিশাল মিছিলে। সেই মিছিলে ছিলেন রফিকুল ইসলাম গোলাপ, মমতাজ জাকির আহমেদ সাবু, সিদ্দিক হোসেন, শেখ আমজাদ হোসেন, ইছাহাক চৌধুরী, হারেস উদ্দিন সরকার, নুরুল হক, মুকুল মোস্তাফিজ, অলক সরকার, ইলিয়াস আহমেদ, আবুল মনসুর আহমেদ, খন্দকার গোলাম মোস্তফা বাটুল, তৈয়বুর রহমান বাবু, মুসলিম উদ্দিন কমিশনার, মাহবুবুল বারী, জায়েদুল আলম, মোফাজ্জল হোসেনসহ হাজারো বীর জনতা। মিছিলটি তৎকালীন তেঁতুলতলায় (বর্তমান শাপলা চত্বর) পৌঁছলে সেখানে শহীদ মুখতার ইলাহী, শহীদ রনী রহমান ও জিয়াউল হক সেবুর নেতৃত্বে কারমাইকেল কলেজ থেকে আরেকটি মিছিল যোগ দেয়। সেদিনের ওই মিছিল রেলস্টেশন হয়ে ফিরে আসার পথে বর্তমান ঘোড়াপীর মাজারের সামনের তৎকালীন অবাঙালি সরফরাজ খানের বাসার ওপর উর্দুতে লেখা একটি সাইনবোর্ড চোখে পড়েনি মিছিলকারীদের। তাৎক্ষণিক ওই সাইনবোর্ড নামাতে এগিয়ে যান মিছিলকারী সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শংকু সমাঝদার, মকবুল হোসেন শরীফুলসহ অনেকেই। আর ঠিক তখনই ঐ বাসা থেকে চালানো হয় গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন শংকু সমাঝদার ও মকবুল হোসেন শরীফুল। শহীদ হন শংকু। তাঁর এ মৃত্যুসংবাদ শহরময় ছড়িয়ে পড়লেই গোটা শহর রূপ নেয় এক ভয়াল শহরে। উত্তাল হয়ে ওঠে রাজপথ। আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলে ওঠে শহরময়। বাঙালিদের ক্ষোভের আগুনে জ্বলতে থাকে অবাঙালিদের বাড়িঘর, দোকান ও প্রতিষ্ঠান। মূলত সেদিনের সে ঘটনার মধ্য দিয়েই রংপুরে সূচনা হয় মুক্তিযুদ্ধের।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাত্র কয়েক দিনের মাথায় ২৮ মার্চ ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাওয়ে আমি ছিলাম নেতৃত্ব পর্যায়ে। একান্তরের ২৫ মার্চের ভয়াল রাতের কথা স্মরণ হলে এখনো গায়ের রোম শিউরে ওঠে রাত ১০টায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে শুরু হলো গোলাগুলি। স্টেশনের বাবুপাড়া থেকে শুরু করে সারা শহরেই গুলি। গোলাগুলির শব্দে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। বাতাসে বারুদের

গন্ধ। কামানের মুখ থেকে বের হওয়া আগুনের ফুলকিতে আকাশ লাল। ভয়াল গ্রাসে সাধারণ মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বিশেষ করে ক্যান্টনমেন্টসংলগ্ন ভগী, ধাপ, রামপুরা, পার্ব তীপুর বখতিয়ারপুর, নিসবেতগঞ্জ, পীরজাবাদের বাড়িঘর ফাঁকা হয়ে গেল। জীবনের ভয়ে সাধারণ মানুষ নদীর ধারে ও ক্ষেত-খামারে আশ্রয় নিলেন। আমার বাড়িতেও কেউ ছিলেন না। আমি একা সাহসে ভর করে বাড়িঘর পাহারা দিলাম। প্রভাতে বেশ কিছু অঞ্চল থেকে হতাহতের খবর পাওয়া গেল।

২৬ মার্চ সকালে গোপনে স্বাধীন বাংলাবেতারকেন্দ্রের খবর পেলাম। খবরে জানা গেল, ২৫ মার্চ রাতেই হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। গ্রেপ্তারের আগেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তিনি বাংলার মানুষকে যা কিছু আছে তাই নিয়ে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আমার মনে পড়ল ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই নিসবেতগঞ্জের বাঁশহাটিতে বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া সংবর্ধ না সভায় বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের কথা এমন সময় বাইরে মোটরসাইকেলের আওয়াজ পাওয়া গেল। মোটরসাইকেল এসে দাঁড়াল আমার উঠানের ঐতিহাসিক কীঠালগাছের নিচে। ঐতিহাসিক এ কারণে যে, ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই এই কীঠালগাছের তলায় জিপ থামিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমার জরাজীর্ণ বাড়ি দেখতে এসেছিলেন এবং এক কাপ লাল চা পান করেছিলেন। ঘটনাটি আমার জন্য ছিল অন্য রকম এক আনন্দের। আজও সেই সময়ের কথা মনে পড়ে। যাহোক, আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। সালাম বিনিময়ের পর মোটরসাইকেলে আরোহী বললেন, আমাকে চিনবেন না। আমি মাহীগঞ্জের মোল্লা মাস্টার। আমাদের এমপি সিদ্দিক সাহেবকে খুঁজছি তাকে সারা শহর খুঁজে আপনার কাছে এলাম সিদ্দিক সাহেবকে খুব দরকার। আপনি নিশ্চয় তাঁর অবস্থান জানেন। আমাকে জানালে আমি তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। আমি বললাম, কী এমন জরুরি ব্যাপার যে তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন? মোল্লা সাহেব বললেন, হ্যাঁ, ব্যাপারটি গোপনীয় এবং জরুরি। আপনি তো আওয়ামী লীগের থানা সভাপতি, আপনাকে বলা যায়। আমার কাছে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত একজন ইন্সপেক্টর রেজিমেন্ট অফিসারের বার্তা আছে সেই গোপন বার্তা জানার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি না করে তাঁকে সিদ্দিক হোসেনের অবস্থানের কথা জানালাম। বললাম, তিনি এখন সম্ভবত শ্যামপুরে আছেন। আর কথা না বাড়িয়ে তিনি শ্যামপুর অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। গোপন বার্তাটি জানতে না পেরে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। সকাল ১০-১১টার দিকে সেই গোপন বার্তাটি জানা গেল। ২৮ মার্চ রংপুরক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করতে হবে। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে পশ্চিমারা নেই, বাইরে গেছে; কিন্তু ট্রেনিংয়ের নামে তারা বাঙালিদের খতম করার ষড়যন্ত্র করছে। এ সময় ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে হবে এবং অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈন্যরা অস্ত্র সারেন্ডার করে জনতার কাতারে মিল হবে। সূচনা হবে মুক্তিযুদ্ধের। রানীপুকুরের কাছে বলদিপুকুর আদিবাসী সাঁওতালদের গ্রাম। তিনি সাঁওতাল নেতাদের ঘেরাও সম্পর্কে আলোচনা করে তীর-ধনুক নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। মরহুম আবুল হোসেন আহমেদ, সংগ্রাম কমিটির নেতা ছাদেক আলী, দর্শনা ইউপি চেয়ারম্যান জাবেদ আলী তামপাট ও দর্শনায় যোগাযোগ করলেন। পরের দিন সকালে আমি গেলাম বদরগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা খিয়ারপাড়ার মজিবর মাস্টারের কাছে। মজিবর মাস্টার আগেই খবর পেয়েছেন। তিনি লোহানীপাড়ার কর্মীদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছেন। আমি গোপালপুরের ছয়ের উদ্দিনের কাছে গেলাম। তিনি রংপুর জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক। আলাপে জানলাম, তিনি ও তাঁর সংগঠনের সবাই ঘেরাওয়ের জন্য প্রস্তুত। রানীপুকুরের রূপসী গ্রামের আলতাফ মাস্টারের কাছে গিয়ে জানতে পারলাম, তিনি আগেই লোকমানের কাছে খবর পেয়েছেন। লোকমান ছিলেন আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান। সহকারী গুড়াতিপাড়ার তৈয়বুর রহমান। আলতাফ হোসেন অ্যাডভোকেটের বাসায় গিয়ে জানতে পারলাম তিনি সাংগঠনিক কাজে বেরিয়ে গেছেন। অতঃপর আমি সিওবাজার হয়ে পাগলাপীর গেলাম। পাগলাপীরে

আজিজার রহমান বুদা, মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ নেতার কাছে গিয়ে কিছু বলতে হলো না। কারণ তাঁরা আগেই খবর পেয়েছেন এবং সর্ব ান্দক প্রস্তুতি চালাচ্ছেন পাগলাপীর থেকে লাহিড়ীরহাট এসে জানতে পারলাম তাঁরা আগেই খবর পেয়েছেন। অতঃপর বাড়ি ফিরে এলাম। দুদিন অনবরত মোটরসাইকেল চালিয়ে শরীরটা ক্লান্ত হয়েছিল। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার শহরে গেলাম। শহরে বিশ্বস্ত সূত্রে একটা খবর পেলাম, ২৭ মার্চ রাতে ইঞ্জিনিয়ারপাড়ার নেহারউকিলের বাড়িতে মিটিং হবে। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ ঘেরাও কার্য ক্রমচালাতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়ার মোহাম্মদ আলী মনছুরকে বললাম, নেহার উকিলের বাসায় না বসে অন্য কোনো জায়গায় বসা উচিত। কারণ নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়ায় বসবাসরত দুজন পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাদের আমি ক্যান্টনমেন্ট যাওয়া-আসা করতে দেখেছিলাম।

বাড়ি ফিরে এলাম। ২৮ মার্চ সকালে আমি আর ইয়াছিন আলীনিসবেতগঞ্জ ঘাঘট ব্রিজের তেমাথায় দাঁড়লাম। লোকজন আসবে কি আসবে না এ রকম একটা সন্দেহে আমার মনে উদ্বেক হয়েছিল। একটি অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা দূর দূর করে কাঁপছিল। দেখতে দেখতে ১০টা বেজে গেল। রাস্তায় লোকজন দেখা যাচ্ছে। তারপর অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। পশ্চিম থেকে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে আসছেন। সবার হাতে বাঁশের লাঠি, ছোরা, বল্লম, কুড়াল, দুই-চারটা তীর-ধনুকও দেখা গেল।

সবার মুখে গগনবিদারী স্লোগান 'এস ভাই অস্ত্র ধর, ক্যান্টনমেন্ট দখল কর'। মিছিলের সম্মুখে কমরেড ছয়ের উদ্দিন। তার পরই এল মজিবর মাস্টারের নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল। ভুরাঘাট, বড়বাড়ী হয়ে লোকজন আসা শুরু হলো। খবর পেলাম, বলদিপুকুর থেকে আব্দুল গণির নেতৃত্বে সাঁওতাল বাহিনী তীর-ধনুক নিয়ে রওনা হয়েছে। রানীপুকুরের রূপসী বালারহাট, গোপালপুর সব জায়গা থেকেই লোকজন ছুটে আসছেন। পাগলাপীরের লোকজন লাহিড়ীরহাট হয়ে আসছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ হয়েছে বলরাম ও আব্দুল কুদ্দুসের বাহিনী। এ ছাড়া ঐতিহাসিক ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও অভিযানে তৎকালীন ছাত্রনেতা অলোক সরকার, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, আবুল মনসুর আহমেদ সর্ব ান্দকভাবে জড়িত ছিলেন

ক্যান্টনমেন্টের পেছনে এখন যেখানে 'রক্তগৌরব' দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সবাই সমবেত হলেন। লোকে লোকারণ্য। আমাদের হাতে বাঁশের লাঠি আর হানাদারদের হাতে আধুনিক অস্ত্র। সবাই লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ক্যান্টনমেন্টের দিকে এগিয়ে চলল। ঐতিহাসিক বালারখাইল পার হয়ে ক্যান্টনমেন্ট মার্কেটের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছাতেই শুরু হয়ে গেল মেশিনগানের গুলি। আমার সামনেই দুই-তিনজন গুলিবিদ্ধ হলেন। তখন জনতার ছত্রভঙ্গ হওয়া শুরু হলো। আমি আর মজিবর মাস্টার ঘাঘট নদী পার হয়ে হিন্দুপাড়ায় ঢুকে গেলাম। হিন্দুপাড়ার লোকজন তখন বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। মজিবর মাস্টারসহ আমি পশ্চিমে এগিয়ে গেলাম। ক্যান্টনমেন্ট দখলের আশা ভঙ্গ হওয়ায় আমার মানসিক অবস্থা ভীতবিল্বল হওয়ার মতো। পরে শুনলাম, ঘেরাও অভিযানে ঘেরাও অভিযানে অনেক লোক হতাহত হয়েছেন। সুগার মিলের চিকিৎসাকেন্দ্রে অনেক আহত লোকের চিকিৎসা হচ্ছে। তাঁদের কাছে শুনলাম, ফেরার পথে নদীর পাড়ে তাঁরা অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন। এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। আমার তখন নেহার উদ্দিনের গোপন মিটিংয়ের কথা মনে হলো। ওই মিটিংয়ের খবর ওখানকার পাকিস্তানিদের সহায়তাকারী ক্যান্টনমেন্টের গোয়েন্দা বিভাগে পৌঁছে দিয়েছিল। ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাওয়ের জন্য সমবেত হয়েছিল ৬০ থেকে ৭০ হাজার লোক। সবাই কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত ও ছাত্র-যুবক। আমার বিশ্বাস, যদি এই ঘেরাও অভিযানের খবর ক্যান্টনমেন্টের গোয়েন্দারা না জানতে পারত, তাহলে নিশ্চয় আমরা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে বাংলাদেশের পতাকা উড়াতে পারতাম।

পাকিস্তানপন্থীরা কেউ কেউ বলে, ওটা ছিল আমাদের হঠকারী সিদ্ধান্ত; কিন্তু আমার বিশ্বাস, জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা কখনো বিফল হয় না। ঘেরাওয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন প্রায় দুই শতাধিক লোক।

১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই নিসবেতগঞ্জের বাঁশহাটির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাঁশহাটির বাঁশের লাঠি নিয়ে তৈরি থেকো। ছয় দফা নয়, এক দফা প্রতিষ্ঠার খবর পাবে।' সেই খবর হয়েছিল ২৬ মার্চ। জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এক দফা কায়েম হয়েছিল। শত-সহস্র মানুষের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়েছিল। জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন-সার্বভৌম

আজ ঐতিহাসিক রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও দিবস **যমুনা নিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম**

আজ রংপুরবাসীর ঐতিহাসিক এক অবিস্মরণীয় বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর গৌরবগাঁথার দিন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালোরাত্রিতে নিরপরাধ স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালী জাতির ওপর পৈশাচিক হামলা আর গনহত্যা শুরুর মাত্র তিনদিনের মাথায় প্রতিবাদী রংপুরবাসী ৭১-এর ২৮ মার্চ লাঠিসোটা, তীর-ধনুক নিয়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে জন্ম দিয়েছিল এক অনন্য ইতিহাসের। ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিক ভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাত্র একদিন পরই রংপুরবাসী ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল- সে পথ ধরেই সূচিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রাম। একাত্তরের ৩ মার্চ। মিছিল আর শ্লোগানে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিল গোটা রংপুর। প্রতিবাদ মুখর মানুষের মিছিলে নির্বিচারে চালানো হয় গুলি শহীদ হন দেশের প্রথম শহীদ কিশোর শংকুসহ আরো তিনজন। তাদের রক্তদানের মাধ্যমে উত্তাল হয়ে ওঠে রংপুর। স্বাধীনতাকামী মানুষ সংগঠিত হতে থাকে। প্রস্তুতি গ্রহণ করে সশস্ত্র সংগ্রামের। এরই অংশ হিসেবে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও এর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্বাধীনতাকামী মানুষ। দিনক্ষণ ঠিক হয় ২৮ মার্চ। ঘেরাও অভিযানে যোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে রংপুরের বিভিন্ন হাটে-বাজারে ঢোল পিটানো হয়। আর এ আহ্বানে অর্ভূতপূর্ব সারা মেলে সাজ সাজ রব পড়ে যায় চারিদিকে। যার যা আছে তাই নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয় এ অঞ্চলের ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ছাত্র, কৃষক, দীনমজুরসহ সকল পেশার সংগ্রামী মানুষ। রংপুরের আদিবাসীরাও তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকে। এক্ষেত্রে মিঠাপুকুর উপজেলার ওরাও সম্প্রদায়ের তীরন্দাজ সাঁওতালদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তীর-ধনুক, বলম, দা, বর্শা নিয়ে তারা যোগ দিয়েছিল ঘেরাও অভিযানে।

সেদিন ২৮ মার্চ ৭১ রোববার সকাল থেকে রংপুরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ সংগঠিত হতে থাকে। সময় যত এগিয়ে আসে উত্তাপ আর উত্তেজনা যেন ততই বাড়তে থাকে। সকাল ১১টা বাজতে না বাজতেই সাজ সাজ রব পড়ে যায় চারিদিকে। জেলার মিঠাপুকুর, বলদীপুকুর, মানজাই, রানীপুকুর,তামপাট, পাটিচড়া, বুড়িহাট, গজাচড়া, শ্যামপুর, দমদমা, লালবাগ, গনেশপুর, দামোদরপুর, পাগলাপীর, সাহেবগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হতে থাকে। সবার হাতে লাঠি-সোটা, তীর-ধনুক, বর্শা, বলম, দা ও কুড়াল।

স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীন লোকজন, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও অভিযানে অংশ নেয়া লোকজন এবয় মেজর নাসিরের লেখা 'যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনত' বই থেকে জানা যায়, ক্যান্টনমেন্টের দিকে যখন প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এগুচ্ছিলেন, তখন এক পর্যায়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রায় ১০টি জীপ বেড়িয়ে এসে তাদের মিছিল লক্ষ্য করে এগুতে থাকে। এক পর্যায়ে জীপ থেকে শুরু হয় একটানা মেশিনগানের

এলোপাথারী গুলিবর্ষণ মাত্র কয়েক মিনিটে থেমে যায় আমাদের সব কোলাহল। চারিদিকে তঁজা রক্তে রঞ্জিত হয় শতাধিক লাশ আর লাশ। সে এক মধ্যযুগীয় বর্বরতা মুহূর্তেই গুলিবিদ্ধ মানুষগুলোর লাল রক্তে ঢেকে গেল মাঠের সবুজ ঘাঁস। ছত্রভঙ্গা মিছিলে তখনও যারা আহত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন তারা দ্বিগবিদিক ছুটে গেল। পুরো এলাকার বাতাস মূমূর্ষ মানুষের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠলো। মেশিনগানের গুলিতে যাদের মৃত্যু ঘটেছিল তাদের নিখর দেহ মাঠের মধ্যে পড়ে রইল। সেদিন অকাতরে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের রক্তের ারেতে বয়ে গেছে পার্শ্ববর্তী ঘাঘট নদী দিয়ে।

ঐতিহাসিক নিসবেতগঞ্জ বধ্যভূমিতে “রক্ত গৌরব” নামে নির্মিত হয় একটি স্মৃতিস্তম্ভ যা আজও নিরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতি বছর এই দিনে স্থানীয় জনগনের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয় ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও দিবস। আগামীকাল বুধবার দিবসটি উপলক্ষে বেলা প্রসাশন এবং ৬ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে শহরের উপকণ্ঠে নিসবেতগঞ্জে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত রক্তগৌরবে দিনভর বিস্তারিত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।